ISSN 2456-4567 (O)

www.ijimr.in

International journal of interdisciplinary and multidisciplinary research

ISSN 2456–4567 (O)

BRATYAJONER KATHASHILPI HARISHANKAR JALADASHER JIBON O SAHITYER NANADIK

।। ব্রাত্যজনের কথাশিল্পী হরিশংকর জলদাসের জীবন ও সাহিত্যের নানাদিক ।।

ডঃ সুশান্ত ঘোষ

কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ , ভারত

Abstract: Haishankar Jaladash one of the eminent author in the modern Bangladeshi Bengali literature .Also he was the founder of sea-centric modern Bengali literature. After Manik Bondyopadhyay he is a successor of boatman's life history writer.He was born in a very poor and subaltern Jaladas community. By profession he was a boatman and fisherman at the earlier life but at later period he taken education from village school and admitted to college and Chattogram University and done his education upto doctorate degree. Thereafter he joined in Government service as an Assistant professor in Chitgoan Government College and take position up to Principal post. He composed many novels and short stories, where he drawing his own subaltern community, its status and position in modern concepts. He won several prizes from several authorities for his literary work. In this article we analysis his life and work in short form.

Keyword: Sea-Centric, Subaltern, Novel and short-stories, Fisherman, Literature.

****

হাল আমলের বাংলাদেশি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে কিংবদন্তী লেখক নিঃসন্দেহে হরিশংকর জলদাস। তিনি একাধারে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, প্রথিতযশা কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। সাবেক পাকিস্তানের চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী পতেঙ্গা গ্রামে এক অতিদরিদ্র কৈবর্তা পরিবারে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় মৎস্য শিকারী জলদাস পরিবার সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর পিতার নাম যুধিষ্ঠির জলদাস। যুধিষ্ঠির জলদাসের অনেকগুলি সন্তান হলেও হরিশংকরকে নিয়ে একটু বেশি চিন্তিত ছিলেন। তিনি হরিশংকরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। নিম্নশ্রেণির কৈবর্ত্য সমাজে জন্মগ্রহণ করার কারণে হরিশংকরকে আশৈশব নানা অপমান ও অবিচারের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তাঁর পিতা যুধিষ্ঠির জলদাস সমুদ্রের লবণাক্ত জলে মাছ শিকার করে সংসার নির্বাহ করতেন। হরিশংকর জলদাস নিজেও ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত পতেঙ্গা ও কর্ণফুলি নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাল্যকালে তাঁর পিতা তাঁকে পতেঙ্গার একমাত্র পাঠশালা 'আদাবস্যার পাঠশালা'তে প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য অর্তি করিয়ে দেন। এই 'আদাবস্যার প্রকৃত নাম দেবেন্দ্রলাল দে। দীর্ঘদিন পূর্বে বাইরের কোনও স্থান থেকে পতেঙ্গায় এসে পাঠশালা খুলেছিলেন। স্থানীয় লোকজন তাকে সম্মান দিতে 'আদাবস্যা' বলে সম্বোধন করত। তখন থেকেই

আদাবস্যা নামের অন্তরালে প্রকৃত পিতৃদত্ত নামটি হারিয়ে গেছে। এখান থেকেই হরিশংকর জলদাস প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পতেঙ্গার পতেঙ্গার একমাত্র 'হাইস্কুল' পতেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে ভর্তি হতে এসে অন্ত্যজ সমাজের মানুষ হওয়ায় তাকে অপমান ও অবহেলার শিকার হতে হয়েছিল। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাৎসরিক এমএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের অনুষ্ঠিত পরীক্ষার, তার কারণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ ন'মাস মুক্তিযুদ্ধে উত্তাল পূর্ব পাকিস্তানে এসএসি পরীক্ষার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পাকমা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেই পরীক্ষাই হরিশংকর জলদাস অবতীর্ণ হয়েছিল। এম.এস.সি পাশের পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি চট্টগ্রামের সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন সেখান থেকে স্নাতক ও পরবর্তী কালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাশ করে বাংলা সাহিত্যে গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হন। 'নিদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত্য সমাজ' শিরোনামে গবেষণা করে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি উপাধি লাভ করেন।

প্রথম থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকতা করার। কিন্তু তিনি প্রথম কর্মজীবন শুধু করেন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা দিয়ে। পরবর্তীকালে তিনি চট্টগ্রাম সিটি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। পতেঙ্গা গ্রামের তিনিই একমাত্র উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চ পেশার ব্যক্তিত্ব। দরিদ্র, অসহায়, ব্রাত্য কৈবর্ত্য মানুষদের উপর-সমাজের উচ্চশিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দু মুসলমানদের যে অবিচার বিরূপ তিনি সারাজীবন মনে রেখেছেন এবং কেবল উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চপেশায় নিযুক্ত হয়ে নখ সরস্বতীর বকলমে তিনি তাদের উপযুক্ত জরাব দিতে নিরলস শ্রম করে। করে লেছেন। এখনো তিনি অতি সাধারণ কৈর্বত্য, কৈর্বত্য, মুচি। মেথর কেই তার সাহিত্যের চরিত্র হিসাবে নির্বাচন করে বাংলা অন্তজ শ্রেণির সাহিত্যের এক বিরাট আন্দোলন সংঘটিত করে চলেছেন।

তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'দহনকাল' এবং 'জলপুত্র' দিয়েই বাংলা সাহিত্য সেবায় অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে তিনি অসংখ্য উপন্যাস, ছোটগল্প, জীবনী সাহিত্য, প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও আধুনিক যুগের বিশেষ পথরেখা দিয়েছেন। ওঁর সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি হিসাবে দেশ বিদেশের বহু সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর একাধিক গ্রন্থ, ইংরেজি সহ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসটি 'The son of the Sea' নামে অনুদিত হয়ে বিশ্বপাঠকের কাছে সমাদর লাভ করেছে। ১৪১৬ বঙ্গাব্দে তাঁর 'দহনকাল' উপন্যাসটি 'প্রথম আলোর' বর্ষসেরা পুরস্কারে ভূষিত হয়। তিনি বাংলাদেশের বাংলা একাদেমি পুরস্কার লাভ করেন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়াও 'ব্যাক ব্যান্ত সমকাল সাহিত্য পুরস্কার', 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার', 'সিটি' আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার সহ নানান পুরস্কারে অলংকৃত ও অহংকৃত তিনি। তাঁর প্রতিবাদী কলমের লেখনী এখনো সচল ও সাবলীল। বাংলা সাহিত্য সেবায় নিবেদিত হরিশংকর জলদাস সত্যিই এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক। বাংলা সমুদ্র কেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রথম ও যথার্থ স্রষ্টা তিনি। কৈবর্ত্য সমাজের ইতিহাসকারও তিনি। তাঁর হাতে ব্রাতা কৈবর্ত্য সমাজ সাহিত্যের কৌলীন্য অর্জন করে যথার্থ স্থান লাভ করেছে।

তাঁর লেখা সাহিত্যগ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ-

ক। উপন্যাস দহনকালে (২০১০), মহীঘর (২০১২) হৃদয়নদী (২০১৩) কসবি (২০১০), রামগোপাল (২০১২), আমি মৃণালিনী নই (২০১৪) জলপুত্র মোহনা (২০১৩), একলরা (২০১৪), রঙ্গশালা (২০১৪) হরকিশোরবাবু (২০১৪), প্রতিদ্বন্দী (২০১৪) এখন তুমি কেমন আছ (২০১৫), 'কোনো এক চন্দ্রাবতী (২০১৫)

এছাড়া 'সেই আমি নই আমি' 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত', জলগদ্য প্রভৃতি উপন্যাস বা উপন্যাসোপম কাহিনী রচনা করেছেন তিনি।

খ। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল-

লচ্চা (২০১২), জলদাসীর গল্প (২০১১), মাকাললতা (২০১৫), গল্পসমগ্র (২০১৫), হরিকিশোরবাবু (২০১৪), কাঙাল (২০১৫), বাছাইবারো (২০১৫)।

গ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলি হল-

কৈবর্ত্য কথা (২০১১), নিজের সঙ্গে দেখা (২০১২)

ঘ। তাঁর প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি হল-

নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত্য জীবনকথা (১৯৮২), লোকবাদক বিনয়বাঁশি (২০১৪),

ধীবর জীবনকথা (২০০১), কবি অদ্বৈত মল্লবর্মন এবং (২০১২), ছোটগল্পে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ(২০০৪)

জীবনানন্দ ও তার কাল (২০১০), বাংলা সাহিত্যে নানা অনুষঙ্গ (২০১২), আমার বর্ণফুলি (২০১৫)।

হরিশংকর জলদাস বাংলা উপন্যাসের এক অবিস্মরণীয় ও ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক। বাংলা সাহিতো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অদ্বৈত মল্লবর্মনের হাতে যে তর্কাতীত সাফল্য লাভ করেছিল হরিশংকর সেই ধারারই উত্তরাধিকার বহন করেছেন তথাপি তাঁর নতুনত্ব অনস্বীকার্য। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' কিংবা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' বাংলা উপন্যাসের এইগুলি সবই নদীকে কেন্দ্র করে লেখা কিন্তু 'জলপুত্র' কিংবা 'মোহনা' নদী নয় নদীর সঙ্গমস্থল সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলের জনপদ ও পরিবেশ এখানে চিত্রিত হয়েছে। সেই কারণে হরিশংকর জলদাসকে বাংলা সমুদ্রকেন্দ্রিক উপন্যাসের স্রষ্টা ও যথার্থ রূপকার বলা চলে।

হরিশংকর সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ, মুচি, মেথর, জলদাস, বেশ্যা প্রভৃতি সমাজ নিন্দিত চরিত্রগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় তার সাহিত্যে নন্দিত করে তুলেছেন। হরিশংকর এক গভীর অপমান ও অবিচার থেকেই কৈবর্তী সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিপক্ষের প্রতি তার প্রতিবাদ তার লেখার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসটিতে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী পতেঙ্গা গ্রামের মৎস্যজীবিদের নিয়ে লেখা মহাকাব্যিক ধরনের উপন্যাস। এই উপন্যসের বাস্তবতা ও নিরপেক্ষতা সমাজ নিন্দিত/ব্রাত্য সমাজের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার এক গভীরতম মূল্যায়ন ধরা পড়েছে জলপুত্র উপন্যাসে। এখানে প্রতিটি চরিত্র অতি সাধারণ, তাদের আশা আকাঙ্খা জীবনযাত্রা সবই অতি সাধারণ তবু চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব। কেননা হরিশংকর কোথাও কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেয়নি। তিনি জানতেন পতেঙ্গার এই জেলে সমাজ সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরবর্তী। তাদের কাহিনী বাস্তবমূল্য উপনাসে আঁকতে গেলে তাদের সঙ্গে অভিন্ন সত্ত্বায় সংশ্রবণ করতে হবে। হরিশংকর, পেরেও ছিলেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে। নিজে কৃতবিদ্য অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ব্যবহারের সময় কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়নি। নিম্নবর্গীয় মানুষের কথোকথনের সময় অশিষ্ট গালিকেও তিনি বর্জন করেননি কেননা নীতির খাতিরে বাস্তবতাকে নস্যাৎ করতে চাননি। এখানেই হরিশংকরের কৃতিত্ব অনেক বড় হয়ে ওঠে। ভুবনেশ্বরীর জীবনের অপেক্ষা থেকে উপন্যাসের শুরু হয় সেই অপেক্ষাতেই শেষ হয় উপন্যাসটি। মাঝে থাকে অতলান্ত বেদনা, হারানোর বিমর্ষতা প্রাপ্তির আনন্দ, আচরণের প্রগলভতা। এখানে ভুবনেশ্বরী কোনও একটি চরিত্র বিশেষ নয়, সে

নিজেই বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শী জলরাশি। যেখানে ঢেউ উঠে আবার ঢেউ নামে। ক্ষণিকের মুহূর্তে চলে ভাঙাগড়া তার বিরাম নেই নিস্তার নেই। পতেঙ্গার জলদাস জলদাসীদের জীবনেও সুখ দুঃখ ওঠে নামে কোথাও স্থিরতা নেই, সমুদ্রের লবণাক্ত জল তাদের চোখের কোণে আশ্রয় নেইন দিগন্ত দিগন্ত বিস্তারী বেদনা, হাহাকার নিয়ে সংসারের বুকে বেঁচে থাকে। অসাধারণ এই উপন্যাসটি বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। The Son of Sea নামে ইংরেজিতে অনুদিত।

'মোহনা' উপন্যাসটি হরিশংকরের কৈবর্ত্য সমাজের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে নিয়ে লেখা অপূর্ব উপন্যাস। প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে ঔপন্যাসিক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখেছেন এটি। এই উপন্যাসের সঙ্গে 'জলদাসীর গল্প' গ্রন্থের মোহনা গল্পটির মিল আছে। বস্তুত দুটির কাহিনী একই। 'জলদাসীর গল্পের মোহনা গল্পেরই বিস্তৃত রূপ 'মোহনা' উপন্যাস। এই উপন্যাসটির মধ্যেও রয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এরশংকর জলদাসের যে কোন উপন্যাসই প্রতিবাদী কন্ঠের অনুরণন। এই উপন্যাসটিও তাই। এই উপন্যাসের তাইনীর কাল একাদশ শতক এবং স্থান বৃহত্তর বরেন্দ্রভূমি। পালরাজাদের সঙ্গে কৈবর্ত্য রাজা চণ্ডকের যুদ্ধ এবং ভীমের পালিত পুত্র চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতায় কৈবর্ত্য রাজার পতন ও বরেন্দ্রীসূর্য ভীমের মৃত্যু এই উপন্যাসের কাহিনী। 'মোহনা' এক অনাথ মেয়ে। বেশ্যাগৃহে প্রতিপালিত এবং ভবিষ্যতে বেশ্যাবৃত্তিই তার পেশা হয়ে ওঠে। এই অক্ষতযোনি মোহনাকে 'আধ পণ কড়ি' দিয়ে চণ্ডক কিনে নিয়েছিল তার সতীত্ব হরণ করার জন্য। ধীরে ধীরে মোহনাকে সে ভালোবেসে ফেলে। এরই মধ্যে জন্মপরিচয়হীন চণ্ডক তার আশ্রয়দাতা কৈবর্ত্যরাজা, বরেন্দ্রীসূর্য ভীম-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আলিরাজা মহীপালের দলে যোগদান করে এবং যুদ্ধে ভীমকে হত্যা করে কৈবর্ত্যরাজত্বকে পালরাজাদের হাতে তুলে দেয়। পরিণামে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করার প্রতিশ্রুতি দেয় পালরাজা। প্রাপ্তি গর্বে উজ্জ্বল, উর্গত চণ্ডক এসে মোহনার কাছে যৌনলালসা মেটায়। যখন সে সেখান থকে চলে যায় মোহনা তার স্বামী বঁাঁটকে দিয়ে চণ্ডককে খুন করে হত্যা করে। দেশদ্রোহী, দেশশত্রু চণ্ডকের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে মোহনা তৃপ্ত হয়। তার মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিবাদী নারীর উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা। দেশপ্রেমের দীপ্তিও তার চরিত্রে উত্তীর্ণ। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত হলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। কৈবর্ত্য সমাজের অতীত গরিমা প্রদর্শন করা এবং দেশপ্রেমের দীপশিখা প্রজ্জ্বলনই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল। সেই কারণে মোহনা সামান্য কৈবর্ত মেয়ে হলেও সে চণ্ডকের মতো হীনবুদ্ধি জাতিশত্রু দেশদ্রোহী। চরিত্রকে ধ্বংস করেছে। একর্মীরে রোমান্টিকতা, মনস্তত্ব, বাস্তবতা, কল্পনা, ইতিহাস এখানে সব মিলে মিশে অসাধারণ রসায়ন তৈরি হয়েছে। উপন্যাসটিও তার অভীষ্ট সাফল্যে পৌঁছতে পেরেছে।

হরিশংকর জলদাসের কালজয়ী উপন্যাস 'দহনকাল'। এই উপন্যাসটি 'জলপুত্র', 'ৈেকবর্ত্য কথা' নামক গ্রন্থ দুটির সগোত্র বলা চলে। হরিশংকর জলদাসের মূল বিষয় যে শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত চির রাতা জেলে সমাজের গভীর মূল্যায়ন সেটি দহনকাল উপন্যাসেও স্বাভাবিক এবং মুখ্যত এসেছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তানী শাসকদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের আত্মত্যাগের যে মুক্তিযুদ্ধ এই উপন্যাসে সেই আবহটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিরাজ করছে। পতেঙ্গার এক অত্যন্ত দরিদ্র ধীবর রাধানাথ জলদাসের ছেলে হবিদাস জলদাসকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য দুর্মর প্রচেষ্টা করছে। রাধানাথের পরিবারে অভাব অনটন এবং তাকে ঘিরেই চলেছে স্বার্থলোলুপতা, অন্যায় জুলুমবাজি, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের ষড়যন্ত্র। গ্রামেরই বর্ধিষ্ণু জেলে নিকুঞ্জ সর্দার, আব্দুল খালেকের সঙ্গে একজোট হয়ে সমগ্র জেলে সমাজকে তাদের করায়ত্ব করার রঙিন বাসনায় তৎপর হয়ে ওঠে। তবে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছে গ্রামেরই এক বিধবা চন্দ্রকলা। তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কণ্ঠ এখানে বজ্রনির্ঘোষ শব্দে পরিপ্লাবিত। এই উপন্যাসের সব চরিত্র সাধারণ অন্ত্যজ সমাজ থেকেই আহরিত, হরিদাস, রাধানাথ,

চন্দ্রকলা, রাধ্যেশ্যাম সকল চরিত্রই আপন ছন্দে বিবর্তিত। এরা সকলে মিলে সমগ্র জেলে সমাজের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। দয়াল হরির প্রতি জালালের প্রতারণা ও তার বিরুদ্ধে রামহরির আত্মবিসর্জন দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ এক অসাধারণ দ্যুতিতে ভাস্বর। হরবানি চরিত্রটি এই উপন্যাসে এক অসাধারণ সৌকর্যে ভরা। সে প্রতিবাদ করেছে বাহুবলে নয়, গানের মধ্য দিয়ে। এভাবে প্রতিটি চরিত্র একত্রে একটি অসংখ্য স্বর জাগিয়ে তুলেছে। অভাবে ও 'দেশের না একসময় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সামিনা হয় পতেঙ্গার কৈবর্ত্য জনগণ। 'পাকিস্তানী হাদার ও বেইমান'দের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। এভাবে তাদের দহন চলতেই থাকে কাল থেকে কালান্তরে। কৈবর্ত্য সমাজ ও তার সম্মান ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য তাদের বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের সম্মিলিত কণ্ঠ বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। উপন্যাসটি এক অসাধারণ বৃনোট ও শৈলীতে লিখিত। এখানেও তিনি গ্রামীণ আঞ্চলিক ভাষাকে অত্যন্ত বাস্তবতা ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রকাশ করেছেন।

হরিশংকর জলদাসের অমরসৃষ্টি তাঁর 'কসবি' উপন্যাসটি। উপন্যাসটি লেখার ক্ষেত্রে কৈবর্ত্য জলদাস জবাদাসীদের কথা গৌণ করে সমাজের নিন্দিত দেহ ব্যবসায়ী বৈশ্যদের নিয়ে মুখ্যত এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষকে উপন্যাস লেখার যে ধারাবাহিকতা হরিশংকর আজীবন বহন করে চলেছেন এই উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রমী নয়। কসবি শব্দটির অর্থ পতিতা বা দেহপসারিনী। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পতিতা পল্লী সাহেবপাড়া ও তার চারিদিকের জনমানুষকে এই উপন্যসে আলোকিত করা হয়েছে। পতিতাবৃত্তি অবলম্বনকারী কসবিরা অত্যন্ত নিন্দিত সমাজের চোখে আবার এই নিন্দিত মানুষগুলোই পুরুষের। কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সমাজের এই বিপরীতমুখী দ্বিচারিতাকেই উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী সচেতনতা ও বিপ্লবী কণ্ঠস্বর এই উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। পিতৃদত্ত নাম ভুলে গিয়ে কসবিরা কতকগুলি ডাক নাম পায়। চম্পা, বনানী, মার্গারেট, মুমতাজ, সুইটি উমা। নামগুলি এক একজন গণিকার পরিচয় প্রদান করে থাকে। কামনা, বাসনা, দুঃখ যন্ত্রণা হাসি আনন্দ গোপন করে পরপুরুষের কাছে নিজেদের শরীর বিলিয়ে দেয়। অশিক্ষিতও অসচেতন হওয়ায় নানারকম প্রতারণা ও অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়। আজীবন বন্দী দশায় দিন কাটে পতিতাপল্লীতে। এদেরই মধ্যে কৈলাস নারী স্বাধীনতা ও সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে। শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রবাদের সারসত্য এদের কাছে প্রচার করে। এসবের জনাই সচেতন মোহিনী মাসি আর কালু সর্দারের তীব্র দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে মারা যায় কৈলাস ও দেবযানী। পতিতাবৃত্তির শেষ হয় না। সচেতন হলেও পতিতাবৃত্তি চলতেই থাকে। বৈদিক যুগ পেরিয়ে রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ যুগ অতিক্রম করে যে বারাঙ্গনা বৃত্তি আজও চলমান তাকে ঠেকাবে কে?

উপন্যাসটির প্রধান সম্পদ এর ভাষারীতি ও চরিত্র নির্মাণ। কাহিনীর স্বাভাবিকতার জন্যই চরিত্রগুলি সাধারণ হয়েও অসাধারণ হয়ে উঠেছে হরিশংকর জলদাস পূর্বের মতোই দৈনন্দিন প্রচলিত কথ্যভাষাকেই তার উপন্যাসের প্রধান ভাষা করেছেন এখানে। ফলে ক্লেদ পঙ্কিলময় বারাঙ্গনা জীবনের গভীরতম মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, নারী স্বাধীনতার জন্য নারী জাগরণ, বেশ্যাপুত্র কৈলাসের হাত ধরে নতুন সূর্যোদয় ঘটলেও, কৈলাসের মৃত্যু উপন্যাসটিকে করুণ রসে আর্দ্র করেছে। এখানে সব 'কসবি' একটিই চরিত্র তা হল সমাজের অবহেলিত অন্ত্যজ চরিত্র। আর এটি দেখলেই জলদাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।

'হৃদয়নদী' উপন্যাসটি হরিশংকরের প্রধান উপন্যাসগুলি তালিকাভুক্ত করা যায়। 'হৃদয়নদী' উপন্যাসটি একটি ভিন্নস্বাদের উপন্যাস এবং এই উপন্যাসকেই প্রথম তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র করে গ্রন্থনা করেছেন। তিনি নিজেই সেকথা বলেছেন- "নগর জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তা হল না। কথাকার হুমায়ূন আহমেদের ছোটবোন সুফিয়া হায়দার তা হতে দিলেন না।

সুফিয়া হায়দার বল্লেন, আপনার উত্তরটি সঠিক নয়। আপনি তো বর্তমানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনযাপন করছেন। আপনার এর বীর পাশের শিক্ষিত মানুষজন ছড়িয়ে আছে। তাদের নিয়ে লিখুন।" এই অনুরোধের ফসল হল 'হৃদয়নদী'। উপন্যাসটি 'শুদ্ধস্বর' প্রকাশনা থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। জটিল প্লটের এই উপন্যাসটিতে দুটি কাহিনী পাশাপাশি অবস্থান করছে। সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ পারভীন আক্তার-এর অতৃপ্ত যৌনচাহিদা এবং অক্ষম স্বামীর কাছে না পাওয়া। পঞ্চাশোর্ধ আক্তারকে বিপন্ন ও বিভ্রান্ত করে তোলে। বাহ্যিক দিক থেকে তার মতো সুখী সংসার খুব কমই দেখা যায়। স্বামীর বদলে তার বন্ধু নিখিলেশ তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। দেহসুখ ও আত্মরতি তৃপ্তির জন্য নিখিলেশকেই সে বেছে নেয়, ফলে গড়ে ওঠে এক ত্রিকোণ প্রেম। এই কাহিনীর পাশাপাশি আরও একটি কাহিনী এই উপনাসে স্থান পেয়েছে। পরভীনের কন্যা স্নেহলতা প্রেম করে। বিবাহ করে একটি মাদকাসক্ত ছেলেকে। শ্বশুরবাড়িতে স্নেহলতা দারুণভাবে অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়েও। শেষপর্যন্ত ফিরে আসেনি পরভীন আক্তারকে সংসারে। একদিকে অতৃপ্ত কামনার যন্ত্রণা অন্যদিকে পারিবারিক বেদনাবহ পরিবেশ তাকে বিমর্ষ বিমূঢ় করে তোলে। সকলের মধ্যে থেকেও গভীর একাকীত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেন। কাহিনীর শেষে কতকটা অতৃপ্তির স্বাদ থেকে যায়। আক্তার পরভীন জীবনকে নদীর মতো গতিশীল ও পতিত পাবনী মতো মনে করেছে। কিন্তু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার কোন দিশা এখানে দেখানো হয়নি। মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রণার কোন উপশম নেই আছে শুধু সান্ত্বনা। এই কথাটিই উপন্যাসটির শেষ উচ্চারিত। পারভীন এই আলোময় নগরজীবনকে হৃদয়নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নদী যেমন আবর্জনা বহন করেও ও সংলাপের দিকে ছুটে চলে মানব। মনিব জীবনের দুঃখকষ্ট আবিলতা সব বহন করেও চলেছে পরিণতির দিক। তাকে কেউ রোধ করতে পারে না। আনন্দের সংগমেই তার গন্তব্য শেষ হয়। "পরভীনের হঠাৎ মনে হল- এটি রাজপথ নয়, এ যেন একটি নদী হৃদয় নদী। বয়ে গেছে সাগর সংগমের দিকে। নদী যেমন তার আশেপাশের সকল আবর্জনা স্রোতের টানে ভাসিয়ে দূরের বহুদূরের সমুদ্রে গিয়ে যায় তার সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটিরও যেমন তার সকল ব্যথা সকল মর্মযাতনা দূরের কোনও আনন্দ সাগরের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

হৃদয়নদী উপন্যাসটিতে আধুনিক নগর জীবনের গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে রচিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় ঋদ্ধ ও ফ্রয়েডিয় চেতনায় জাগ্রত এই উপন্যাস। ভাষার মাদকতা ও সাবলীলতা উপন্যাসটিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে।

'একলব্য' হরিশংকর জলদাসের আরও একটি কালজয়ী উপন্যাস। কৈবর্ত্য সমাজের অতীত ইতিহাস এবং কিংবদন্তীকে অসাধারণ পরিপাট্যে পরিবেশন করেছেন এই উপন্যাসে। মহাভারতে চিরব্রাত্য একলব্যকে নিয়ে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। অনার্য অবহেলিত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় একলব্যকে আজীবন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। দ্রোণাচার্য একলব্যকে শিষ্য করতে অস্বীকার কেবল করেননি যাতে একলব্য কোনওদিনও নিজের বিদ্যাকে কাজে লাগাতে না পারে তার জন্য ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে দিতে বাধ্য করেছিলেন গুরুদায়িত্ব নামে। এক কলঙ্কজনক অধ্যায় এটি। শিক্ষা ত্যাগ এসবের প্রাধান্য না দিয়ে কেবল জাতের দোহাই দিয়ে অস্পৃশ্য মানুষের অধিকারকে নস্যাৎ করার ঘৃণিত চক্রান্ত করেছিলেন দ্রোণাচার্য। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে যখন প্রতিপক্ষ অর্জুনের বাণে মারা যায় তখনও একলব্য নিজের বক্ষকে ঢাল করে দ্রোণাচার্যকে বাঁচাতে উদ্যত হয়েছিল। নিম্নবর্গীয় একলব্যের আত্মত্যাগ ও সহনীয়তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন হরিশংকর। আর্থ অনার্যের হচ্ছে অনার্যদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তবু তাদের কৃতিত্ব আত্মত্যাগ সহনীয়তা চির অম্লান। আধুনিক যুগেও এই বৈষম্য দূর হয়নি। কৈবর্ত্য সমাজের প্রতি উচ্চশ্রেণীর জাতিগবী কিছু মানুষের হৃদয়হীনতা ও অবহেলা হরিশংকর জলদাসের মনকে বেদনার্ত করেছে। কালের প্রেক্ষাপটে

তিনি এই জাতিতত্ত্বের ধারণাকে পূর্ণ মূল্যায়ন করেছেন। এক অসাধারণ উপন্যাস এটি। ভাষার ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য এবং উপন্যাসের গতিশীলতা অসাধারণত্ব অর্জন করেছে।

হরিশংকর জলদাসের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মহীথর'। মহীথর অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে যাকে মেথর বলা হয়ে থাকে তাদের জীবনযাত্রা এবং উচ্চশ্রেণীর মানুষদের ঘৃণা অত্যাচার এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মন্ত্রীখর পরিবেশের সন্তান রামগোলাম তার নামের প্রকৃত কারণ জানতে চান তার দাদু সর্দার গুরুচরণের কাছে। স্বয়ং ব্রহ্মা তার দেহের ময়লা থেকে মহীথরদের তৈরী করেছিল বিষ্টা পরিষ্কারের জন্য। এলাহাবাদ, কাচনপুর প্রভৃতি স্থান থেকে মোঘল সম্রাট। ব্রিটিশ শাসকেরা বিভিন্ন শহরের মতো সাফাই কার্যের জন্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলির নদীর ধারে ফিরিঙ্গী বাজারে তাদের নিয়ে আসা হল ও ফিরিঙ্গী পল্লী থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে দেওয়া হল। এদেরই তিনটি প্রজন্ম পিতামহ গুরুচরণ মহীথর পুত্র শিউচরণ মহীণর এবং পৌত্র রামগোপাল মহীথর এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। সদ্য কর্পোরেশনের চাকুরীতে ঢুকেছে শিউচরণ বয়স মাত্র আঠারো এই বয়সেই তাকে বিবাহ দেওয়া হল এবং রামগোলামের জন্ম হল। শিউচরণের জীবনে লেখাপড়া শিখতে না দেওরী উচ্চবর্ণের অত্যাচারের ফলে। আর সেই কারণে রামগোলামকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে ভয় পায় শিউচরণ। অবশ্য শিক্ষিকা কল্যাণী মহোদয়ের চেষ্টায় রামগোলাম স্কুলে ভর্তি হয়। সে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। আম্বেদকরের মতোই ই সে সে নীচু নীচু হাতেয় হার্ভের অসহায়তা থেকে আলোয় উত্তরণ হতে যায়। দেশভাগের পর কর্পোরেশনের সাফাওয়ালাদের চাকরি সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে কর্ম ও জীবনসংকটে পড়ে মহীরথরা। নতুন প্রজন্ম রামগোলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বলে দেয় তারা আর কেবল মেথরের পেশা নিয়েই থাকবে না। আম্বেদকরের মতো উচ্চপদে চাকরিও করবে আর সেখানে গিয়ে যেন তার গরীব অসহায়, অশিক্ষিত মেথর সমাজের কথা না ভোলে রামগোলাম। যেমন ভোলেনি বাবাসাহেব আম্বেদকর। যে মেথরদের উচ্চবর্ণের মানুষরা একদিন ঘৃণার চোখে দেখত তাদের কাছে মেথরের পেশাটা চাকুরির জন্য গ্রহণযোগ্যতা পেলেও মেথররা রয়ে গেছে সমাজে আজও।

'মহীথর' উপন্যাসের পর হরিশংকর জলদাস মেথর সমাজকে নিয়ে আরও একটি কালজয়ী উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেটি হল 'রামগোলাম'। বস্তুত গ্রন্থটি মহীথর উপন্যাসেরই 'উত্তরকাণ্ড' বলা চলে। কেননা মহীগর উপন্যাসটি যেখানে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। সেখান থেকেই 'রামগোলাম' উপন্যাসের প্রকৃত সূচনা হয়েছে। রামগোলাম' উপন্যাসটির নায়ক রামগোলামের উত্থান পতনের কাহিনী থাকলেও তা অচিরেই সমগ্র মহীথর সমাজের উত্থান পতনে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মেথর সম্প্রদায় এক গভীর অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়ে। যে মেথর সমাজকে এতদিন অস্পৃশ্য বলে উচ্চবর্ণরা দূরে ঠেলে দিয়েছিল তাদের কর্মের প্রতি এক সুগভীর ঘৃণা ও অচ্ছেদা থেকে, সেই পেশাকেই কর্পোরেশন সবার জন্য উন্মুক্ত করে নিল। ফলে মেথর সমাজের একচ্ছত্র প্রভাব ভেঙে পড়ল। গরীব, অসহায়, সমাজ বঞ্চিত মেথর সমাজ গভীর সংকটের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেও ব্যর্থ হয়। বৃদ্ধ গুরুচরণ সর্দার নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সে তার পৌত্রের মধ্যে খুঁজে পায় মহান নেতাকে। শিক্ষিত রামগোলামও নেতৃত্ব দেয় মেথর আন্দোলনের। নবজাগরণ ও গণজাগরণ ঘটাতে চেষ্টা করে। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ রামগোলাম সংকট মুহূর্তে দাঁড়িয়েও তাই অঙ্গীকার করেছে "জান দেব-কিন্তু মেথরদের পেটে লাথি মারতে দেব না।' মহান নেতার চরিত্র বিকশিত হয়েছে তার মধ্যে। নিজ সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব সে কাঁধে তুলে নিয়েছে। ভারতের দলিত সমাজের মহান নেতা ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছায়া এখানে অস্পষ্ট হলেও অনুভূত হয়। সমাজ মানুষের দ্বিচারিতাও এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। মেঘর সমাজ অস্পৃশ্য কিন্তু তাদের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজটি এতদিন ব্রাত্য হলেও কর্পোরেশন তাকে সরকারি চাকুরির মর্যাদা দিলে উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাতে অংশগ্রহণ করে ফলে মেথর ঘৃণিত হলেও তার পেশাটা

চাকুরির কৌলীন্য অর্জন করে উচ্চবর্ণের কাছে আদরের সামগ্রী হয়ে ওঠে। এই দ্বিচারিতা এই উপন্যাসের মধ্যে লেখানো হয়েছে। যে রামগোলাম একদিন তার নামকে ঘৃণার চোখে দেখে নাম রাখায় প্রকৃত কারণ জানতে চেয়েছিলেন সর্দার গুরুচরণের কাছে, সেই রামগোলাম আজ নিজেকে সমাজ ও জাতিকে ভালোবেসে তাদের গভীর সংগট থেকে আলোয় উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। তার হাত ধরেই মেথর সমাজের রাত্রির বুকে শাশ্বত সূর্যোদয় ঘটার ইঙ্গিত দিয়েছেন উপন্যাসিক। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় নিম্নবর্গের উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম বলা চলে। ভাষাশৈলী, নির্মাণ কৌশল, চরিত্র বিন্যাস, বাস্তবতা সবদিক থেকেই হরিশংকরের পাকা হাতের লেখা এটি।

হরিশংকরের অন্য অন্য একটি উপন্যাস হল 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এই উপন্যাসটি হরিশংকরের মূল ধারার উপন্যাস থেকে আলাদা ও দেয়া নদীর সগোত্র। এখানে হরিশংকর মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু পরিবারের দ্বন্দ্বকে উপন্যাসের মূল কাহিনি হিসাবে এনেছেন। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে ততই সমাজে অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে এবং মানুষ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ত্যাগের মহিমা বিস্মৃত হচ্ছে। এই উপন্যাসে সে কথাগুলিই প্রকাশ পেয়েছে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নামটি বহুমাত্রিক। পারিবারিক সামাজিক, ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক সমস্ত স্তরেই মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বীতা অনিবার্য। একটি বাড়ি দখলকে কেন্দ্র করে সেন ও দত্ত পরিবারের দ্বন্দ্বই এখনে মুখ্য কাহিনী। আদিমকাল থেকে মানবজীবনের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অন্তর্মুখী করে তোলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্ব যে বিচ্ছিন্নতা, সুরই ও হিংসার জন্ম দেয় এই উপন্যাসে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে ব্যক্তিদ্বন্দ্ব অচিরেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের এপ পেয়েছে এবং রাজনৈতিক রং পেয়েছে। চক্রান্ত, প্রতি চক্রান্ত এই উপন্যাসটিকে

আধুনিক সমাজকে উনিয়ে দেয়। এই উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। এখানে সবচেয়ে আলোকিত চরিত্র প্রতিমা চৌধুরী আসলে চট্টগ্রামের বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা রমা চৌধুরীর ছায়ায় রচিত। মুক্তিযুদ্ধের শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গানারা আজও উপেক্ষিত, তারা তাদের প্রকৃত সম্মান পায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক চক্রান্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের কৃতিত্বকে নস্যাৎ করার চেষ্টা ও অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল এই ভাবনাটিও এখানে আছে। গ্রন্থটি হরিশংকর জলদাসের পরিণত হাতের লেখা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দলিল বিশেষ। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি ২০১৫ সালে 'ব্র্যাক ব্যাংক সমকাল সাহিত্য পুরস্কার-২০১৪' পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি।।

'আমি মৃণালিনী নই' উপন্যাসটি হরিশংকর জলদাসের অমর কীর্তি। রবীন্দ্রজায়া মৃণালিনীর আত্মকথনের মাধ্যমে উপন্যাসটি লিখিত। বাল্যকালে ভবতারিণী দেবী ধীরে ধীরে কিভাবে মৃণালিনীতে রূপান্তরিত সেই কাহিনীই অসাধারণ রোমান্টিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পরিবেশিত হয়েছে।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গাবাসী 'জলপুত্র' ড. হরিশংকর জলদাস উত্তর আধুনিক কালের বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক কেবল নন, ছোটগল্পকার হিসাবেও তিনি এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস রচনার প্রতি তাঁর সমধিক আগ্রহ থাকলেও ছোটগল্প রচনাতেও তিনি অকৃপণ। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য এবং প্রসঙ্গ, রচনারীতি ভাষাপ্রয়োগ, শৈলীনির্মাণ সমস্ত দিক থেকেই তাঁর গল্পগুলি নতুনত্ব ও অসাধারণত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ছোটগল্পের দারুণ বিবর্তন ঘটেছিল, বাংলাদেশী বাংলা সাহিত্যেও ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। নিম্নবগীয় ও প্রান্তীয় ব্রাত্য সমাজের অবহেলিত মানব সম্প্রদায় এবং আর্থসামাজিক তথা রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে তাদের জীবন ও জীবিকার দ্বান্দ্বিক রূপরেখাগুলি বাংলা ছোটগল্পে অভিন্ন রীতি পদ্ধতি হিসাবেই সমগ্র বিশ্ব বাংলা সাহিত্যে উঠে এসেছে। কেননা দেশভাগ, স্বাধীনতা, সমাজের প্রত্যন্ত নিম্নবর্গীয় জনজাতিকে কোনও

পরিবর্তনের দিশা দেখাতে পারেনি। জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা এগুলো অবিকৃতভাবেই রয়ে গেলো সমাজে। হরিশংকর জলদাস সমাজকথিত অতি নিম্নবর্ণের মানুষ। সারা জীবন তাকে সেই যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। প্রতিপক্ষকে জাত্যাভিমানের জবাব দেবার জন্য গবেষণা পর্যন্ত করেছেন কৈকত্য সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা তথা নৃতাত্ত্বিক উৎসের খোঁজে। সেই কারণে তার প্রায় সমস্ত সাহিত্য, নিম্নবর্গীয় প্রান্তবাসী কৈবর্ত্য জলদাস জলদাসীদের নিয়ে রচিত হয়েছে। 'জলপুত্র', 'মোহনা', 'একলব্য', 'কসবি' প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাস তার নিজ সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষ ও সমাজের ঐতিহাসিক ও সামাজিক দলিল হিসাবে গণ্য হতে পারে। 'জেলের পউলা' হরিশংকর উপন্যাসের মতোই ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর চিরপরিচিত কৈবর্ত্য সমাজের অতি সাধারণ ঘটনা ও চরিত্রকে এনে। তাঁর 'জলাদাসীর গল্প' গ্রন্থটির 'শটি গল্পেই তিনি প্রাস্তায় জেলে সমাজের রমণীর প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই এনোছেন কেননা কৌম সমাজের নতো চট্টগ্রামের পতেঙ্গাবাসী কৈবর্ত্য সম্প্রদায় সমবায়ী। পুরুষ নারী একই কর্মে লিপ্ত থাকে। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে। এই কর্তব্যপটু অতীব সাংসারিক জলদাসীদের অনেক দিক রয়েছে। হরিশংকরের গল্পে জলদাস ও জলদাসীদের গলার স্বচেতনে লুকিয়ে থাকা অচেনা কাহিনী মূর্ত হয়েছে অত্যন্ত বাস্তব সমৃদ্ধ৮ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার গল্পগুলি আঞ্চলিকতার রঙে বর্ণময় এবং চিত্রায়নে জীবন্ত। গ্রন্থটি প্রকাশকালে সম্পাদক যথার্থই লিখেছেন- "হরিশংকর জলদাস সমুদ্রপাড়ের জেলেদের নিয়ে লিখেছেন 'জলপুত্র' ও 'দহনকাল' নামের উপন্যাস। এবার লিখলেন 'জলদাসীর গল্প', 'জেলেনারীদের নিয়ে হরিশংকরের প্রথম সরগ্রন্থ এটি। জেলে দাম্পত্যজীবন সমবায়ী। এ জীবনে নারী-পুরুষের সমান অবদান। কিন্তু অন্যান্য সমাজের। মতো জেলেনারীরাও বঞ্চিত অবহেলিত। তাদের মর্মন্তদ হাহাকার, বিপর্যয় বিপন্নতার বেদনাদীর্ণ গৃহকোণে সমরে মরে। হরিশংকর গ্রন্থস্থ দশটি গল্পে এই জেলেনীদের জীবনকথা শুনিয়েছেন / সেই কারণেই নামকরণ করেছেন 'জলদাসীর গল্প' ।

তাঁর 'কোটনা' ছোটগল্পটি পরিণত হাতের রচনা না হলেও অসাধারণ এক নতুনত্বের দাবিদার। নিজের নায়ের বেশ্যাবৃত্তি ও পরকীয়া যৌনাবাস এই গল্পের মূল বক্তব্য। জেলেনারীরা পরকীয়া প্রেমে ও পরকীয়া মিলনে তৎপর থাকে। এই বিষয়টিকেই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। সেই কথাটি বলার স্থান হয়েছে গল্পের একেবারে শেষে মাত্র দুটি লাইনে দুই শৈশব ও কৈশোর বন্ধুর পূর্নমিলনের সময় কথোপকথনে। আমাদের দেশে নবজাগরণ ঘটলেও সাম্প্রদায়িকতা ও নিম্নবর্ণীয় মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা কখনো দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। দেশভাগের পর স্বাধীন বাংলাদেশেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানদের কাছে নিম্নবর্গীয় কৈবর্ত্য সমাজ ছিল ঘৃণা ও উপেক্ষার পাত্র। গল্পটিতে বর্ণবৈষম্য এবং নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা লাভের অপ্রতুলতার কথা গল্পকার দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন। মুচির ছেলে অশোক ঋষিদাস ওরফে অশোক দাস ওরফে অশোক চৌধুরী এবং তার আশৈশব বন্ধু ও সহপাঠী ক্ষীরমোহন জলদাস একই স্কুলে ভর্তি হয় প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য। স্কুলে ভর্তি হবার সময় অশোক অনুভব করে তারা নিম্নবর্গের মানুষ এবং তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষেরা ঘৃণা পোষণ করে। অশোককে ভর্তির সময় তার বাবাকে হেডামাস্টার অপমান করে মুচি বলে।। "মুচির ভোলে পড়বে, জুতো সেলাই করবে কে? স্কুলের শিক্ষক মৌলভী সাহেবের অনুরোধে স্কুলে ভর্তি হলেও প্রধান শিক্ষক ভবতোষ চক্রবতীর কড়া নির্দেশ ছিল- "ক্লাসের একেবারে শেষে বেঞ্চে বসবি তুই, খবরদার সামনের বেঞ্চিতে বসার চেষ্টা করবি না।" বর্ণবৈষম্যের শিকার অশোক আর ক্ষীরমোহনের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ক্ষীরমোহন গড়াশোনায় অশোকের চেয়েও ভালো। 'দুর্দান্ত' 'ভয়ঙ্কর' রেসাল্ট পরনে শ্রে। এ হেন ক্ষীরমোহন একদিন সবকিছু তাগ করে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। 'জলপুত্র' শ্যামচাঁদ পুত্রশোকে মারা যায়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর ক্ষীরমোহনের সাথে পূর্নমিলন ঘটে অশোকের। ইতোমধ্যে অশোক মুর্চি মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট কার্ডে নিজের পদবী পরিবর্তন করে চৌধুরী লেখে এবং কায়স্থ মেয়েকে বিবাহ

করে মুচি থেকে কারস্থ হয়ে যায়। সমাজের চোখে সে এখন উচ্চবর্ণ কেউ তাকে অপমান বা অসম্মান করে না। জীরমোহন নিজের জাত সম্প্রদায়ের জন্য গর্ব করত এবং প্রধান শিক্ষক তাকেও অশোকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর পদবী যোগ করার পরামর্শ দিলে সে ঘৃণা করে তা ত্যাগ করে। এহেন মেধাবী, গর্বিত যুবক যখন হারিয়ে যায় এখন তার পিছনে থাকে কোন না কোনও কঠিন সত্য। সেই সত্যটি যখন অশোক জানতে চায় তখন আরমোহন জলদাস জানায় সত্য কথাটি "আমি ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম সেদিন। তারপর মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে। হ্যাঁ, বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে বেশ্যার দালালি করেছি এতদিন।' তার এই অনাকাঙ্খিত পরিবর্তনের কারণটি খুব বেদনাদায়ক অথচ নির্মম সত্য। "তোমার মনে আছে কিনা জানি না। যেদিন হেডস্যার তোমার পদবী নিয়ে রঙ্গ তামাশা করলেন, সেদিন একটু আগেভাগেই স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে তুমি চলে গেলে তোমার বাড়ির দিকে। আমি পা বাড়ালাম আমার ঘরের দিকে। না তো মরে আছে। এদিক ওদিক তাকালাম। মাকে দেখলাম না। ঘরে বাঁশের দরজাটা আধো খোলা। আমি আনমনে ঘরে ঢুকে গেলাম।'.... তাকিয়ে দেখলাম ঘরের ভেতর মা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাকা। তার বকের উপর।" বিবাহে অনিচ্ছুক কাকার সঙ্গে বাবাকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ শারীরিক মিলনে প্রবৃত্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে ক্ষীরমোহনের কাছে বেশ্যাবৃত্তি বলে মনে হয়েছে। নিম্নবর্গীয় জলদাসীদের মধ্যে এটা যে স্বাভাবিক একটা বিষয় তা মানতে পারেনি 'গর্বিত'ও 'ভয়ঙ্কর' মেধাবী ক্লাসে 'থার্ড' হওয়া ক্ষীরমোহন, তাই নারায়ণগঞ্জে বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে বেশ্যার দালান যাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'কোটনা' বলে সেই পেশা গ্রহণ করেছে। কেননা তার মনে তার মায়ের প্রতি যে তীব্র ঘৃণা ও বিকর্ণার জাগ্রত হয়েছিল তাতে নিজেকে 'বেশ্যাপুত্র' বলেই মেনে নিয়েছিল। 'বেশ্যার পোলার কোটনা হওয়াই তো স্বাভাবিক এই ধারণায় সে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে।গল্পটি ছোটগল্পের 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ' এই অতৃপ্তির লক্ষণাক্রান্ত ।

হাওয়া বেরোতে লাগল। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামলেন তিনি। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিতর থেকে হুড়কো তুলে দিলেন দরজায়।

ঘরের ভিতর থেকে মালতীর কণ্ঠ ভেসে এল 'করেন কি, করেন কি ছার ?'

তারপর চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে আবার মালতির কণ্ঠ, আপনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছার, আমি সামান্য জলদাসী।

তারপর খাটের শুধু কোঁৎ কোঁৎ শব্দ।

এভাবেই হরিশংকর জলদাস আদিম জৈবিক চাহিদার বিজয়বাণী ঘোষণা করেছেন। ।। মিথুন জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম, নারীপুরুষের মিলন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু জাতের দোহাই দিয়ে তাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়, মিথ্যা জাতের বড়াই করা মুখোশধারী উচ্চশ্রেণীর আসল চেহারাটা হারিশংকর বাইরে টেনে বার করেছে। সুবিমলবাবুর চরি এতে লঘু হয়নি বরং স্বাভাবিকতাকে স্থান দেওয়ার একজন যথার্থ রক্তে মাংসে গড়া মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে। এখানে উচ্চ শ্রেণীর নারীলোলুপতা নয়, অবচেতনে লুকিয়ে থাকা অবদমিত কামনার বিস্ফোরণ ও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে এ ধরনের চরিত্র অনেক আছে। সুবিমলবাবু একটি টাইপ চরিত্র। আর সকল মানুষের মতোই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রার পাশাপাশি যৌনকামনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতাকেই এখানে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এবং জাতের অহংকার আর মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করলে যে জীবনে আনন্দের বসন্ত আসতে পারে এ গল্পে সেকথাই বলতে চেয়েছেন জলদাস। তাই কোকিলের গান দিয়েই গল্প শেষ করে সুবিমলবাবুর জীবনে বসন্তের আনন্দঘন আগমন বার্তার শুভ সূচনা করেছেন "বাইরে তখন শুধুই খাঁ খাঁ, নির্জনতা। দূর শিমূল গাছ থেকে

কোকিলের আওয়াজ ভেসে আসছে কু-উ-উ, কু-উ-উ।' অত্যন্ত সরলধর্মী এই ছোটগল্পে ভাষা প্রয়োগ, জানাজাতি ভীষণভাবে নতুনত্বের দাবী রাখে। গল্পের একেবারে শেষে গল্প সমাপ্ত হবার পরও অতৃপ্ত ব্যঞ্জনা রেখে গেছেন গল্পকার। মান্য চলিতের পাশাপাশি, চাটিগ্রামী কথ্য ভাষার প্রয়োগ করে ছোটগল্পটিকে অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলেছেন।

'দুখিনী' গল্পের মধ্যে কৈবর্ত্য সমাজের নিদারুণ এক বাস্তবতায় প্রকাশ করেছেন। গল্পটির বক্তব্য সামান্য অগোছালো হলেও গয় একটি সার্থক ছোটগল্প। কৈবর্ত্য সমাজের ছেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে অনেকসময় ফিরে আসে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে দু িখিনী' গল্পে 'দুখিনী' শব্দটি বহুমাত্রিক প্রয়োগে শুদ্ধ। দুঃখিনী মনমোহনের মা, দুঃখিনী তার নবাবিবাহিতা স্ত্রী অনন্তবালা। সকল 'জেলেনি'রাই দুঃখিনী। বেই দামী পরিত্যংসা হয়ে কেউ স্বামীকে অকালে হারিয়ে কেউ বা পুত্রশোকে দুখিনী। এই গল্পে অভাবের আড়নায় অভূক্ত অর্ধভুক্ত জেনে রমণীর জীবনের দুর্বিপাক ও অসহ্য অসহায়তার রূপটিই মুখ্য হয়েছে। একবার contrast বা বৈপরীত্য তৈরী করেছে এই গল্পে। মনমোহন আর কালাবাশি দুই বন্ধু। মনমোহনের বাবা তাদের ত্যাগ করে পূর্ণবিবাহ করেছে। মা অনন্তনালা তাদের মানুষ করেছে ভিক্ষাবৃত্তি করে। অন্যদিকে কলাবীনির মা নেই বাবা বৃদ্ধ এবং কালাবাশির বিরাহ নিয়ে উদাসীন। মনমোহন বিবাহিত কালাবাঁশির বিবাহ হয়নি। আলাবাশি সাঁতার জানে না, মনমোহন সাঁতার জানে। এক ভয়ংকর বিপদের দিনেও কালাবাশি সাতার না জেনেও প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয়। মনমোহন সাঁতার সাঁতার জেনেও অকালে প্রাণবিয়োগ করে। এভাবে একাদিক contrast তৈরী করা হয়েছে গল্পটির মধ্যে। গল্পের শেষের অংশটুকুই এ গয়ের ব্যঞ্জনা দেয় এবং

ছোটগল্পের অতৃপ্ত ভাবটি প্রকাশ করে। মনমোহনের বাধা অভাবের তাড়নায় ভিনগ্রামে কাজ করতে গিয়ে সেইখানেই পুনরায় বিবাহ করে সংসারী হয়। পূর্বতন পরিবারকে ভুলে যায়। মনমোহন তার আরেক অন্ধভভ্রাতাকে নিয়ে মা অনন্তবাল্য কোনক্রমে বেঁচে থাকে। পরবর্তীতে মনমোহনকে বিবাহ দেয়। কিন্তু এই মনোমোহনই অকালে মারা যায় সমুদ্রের জলে। আর কাকতালীয় ভাবে তার মৃতদেহটি তারই পিতার জালে উঠে আসে। পরিতাক্ত পুত্রকে চিনতে পারে তার বাধ্য। কিষ্টপদ ভালো করে চেয়ে দেখে মৃতদেহটির চিবুকে মস্ত বড় একটা তিল।' এই ইঙ্গিতময়তার মধ্যেই গল্পটি বাজনাসৃষ্টি করে ও গল্পটি সহসাই শেষ হয়ে যায়। আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। একটি অকৃত্তিকর জণ্যরক থাকে। কিষ্টপদ নিজের সন্তানের মৃতদেহ দেখে কি করেছিল তারা কোনও উল্লেখ এখানে নেই। অনেকগুলি প্রশ্ন পাঠকের কাছে রেখে সহসাই গল্পটি শেষ হয়ে যায়। গল্পটির বুনোট অত্যন্ত দুর্বল। কাহিনীর তেমন কোন উচ্চতার নয়, কেবল বর্ণনা ও পরিবেশন জগ অনন্য সাধারণ। প্রশিক্ষিত বাগ্মীর ন্যায় ভাষার সরলতা ও উজ্জ্বল। গল্পটির সম্পদ। তবে এসবের মধ্যেও গল্পের উদ্দেশ্য 'জেলেনিদের' সাতলামামি বর্ণনা সেটি বেশ সুন্দরভাবে পরিবেশিত। মনমোহনের মা, মনমোহনের বউ, কিষ্টপদর বউ, যে পরিচয়েই জেলেনিরা পরিচিত হোক না কেন। তাদের দুঃখ বেদনার রোজ নামচাই এখানে একাশিত হয়েছে। কেবল কিউপদর প্রাক্তন স্ত্রী কিংবা মনমোহনের মা দুঃখি নয়, মনমোহনের নব্যবিবাহিতা। স্ত্রীও তো স্থার্থী, বস্তুত প্রাতাক জলদাসীই আজন্ম দুঃস্বী। এখানে সে কথাই বলা হয়েছে। মনমোহনের মং, জিব স্ত্রী এখানে উপলক্ষ মাত্র। জলবাসীদের প্রকৃত ভাগ্য নির্ধারক আসলে পতেঙ্গার বঙ্গোপসাগারের উত্তাল লবনাজ জলস্রোত। এই দিক থেকে দেখলে গন্তটি যথার্থ হয়ে ওঠে। অন্যসকল গল্পের মতোই হরিশংকর এখানেও চট্টগ্রানের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করেছেন এবং স্থানিক রঙকে যথার্থতার সাথে বিকশিত করে তুলেছেন।

টেন্ডেরি' হরিশংকরের পরিণত প্রতিভার সার্থক প্রকাশ। এই গল্পে গল্পকার সকল দিক থেকেই সিদ্ধিলাভকরতে সক্ষম হয়েছেন। "টেন্ডেরি'তে লেখক জেলে দাম্পত্যজীবনের আঁধার দিকটিকে তুলে ধরেছেন।' বাস্তবদৃষ্টিতে গল্পটির ভাষা অত্যন্ত অশ্লীল বলে মনে হবে। কিন্তু যদি জেলে সমাজের দাম্পত্যজীবনের প্রাত্যহিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাহলে এই অশ্লীলভাষাগুলি বাস্তব ও নিরাসক্ত দ্রষ্টার যথার্থ পরিচয় বেয়। গল্পটি চূড়ান্তভাবে মনস্তাত্ত্বিক। স্বামী স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম নিয়ে উত্তপ্ত কথোপকথন খুবই আনন্দদায়ক ও উপযোনী হয়েছে এই গল্পে। পরনারীর সঙ্গে বহদ্দার রাইগোয়াল জলদাসের 'পরকীয়া তার স্ত্রী লক্ষ্মীবালাও জানে। কিন্তু রাইগোয়াল তার স্ত্রীকেই পরকীয়া দোষে দুষ্ট বলে গালি দেয়, লক্ষ্মীবালাও তার উপযুক্ত জবাব দেয়। লক্ষ্মীবালার অখণ্ড যুক্তি যখন খণ্ডন করতে পারে না তখন দুটি জালের মালিক বহদ্দারের গর্বে উন্নত বুক বাইংগারাল স্ত্রীকে তার সম্মান রক্ষা করতে বলে কেননা বহদ্দারের 'ইজ্জত' চলে গেলে জেলে জেলেনীরা আসতাদি করার। "নো চিল্লাইও। চিল্লাইলে বগলের গন্ধ পাড়াপশি। টের পাইবো। বহদ্দার নাম বঙ্গ সাগরত ডুব্বো।' নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে ফেলে রসবালার সঙ্গে লিপ্ত হায় অবৈধ্য প্রণয়ে। রাতের অন্ধকারে লক্ষীবালাকে দিয়ে বহদ্দার রাইগোপাল প্রত্যহ রসবালার সাথে মিলিত হয়। লক্ষ্মীবালা তার স্বামীকে ভালোবাসা, যৌবন, মুল্য, এগড়া সব দিয়েও ফিরিয়ে আনতে অসমর্থ হয়। হরিদাসীর মা এসেও লক্ষ্মীবালাকে তার স্বামীর কুকীর্তির কথা বলে। তুমুল বাদবিসম্বাদ চলে। কিন্তু কোনভাবেই তার স্বামীকে ফেরানো সম্ভব হয় না। এভাবে থাকতে থাকতে অপমানে ন্যুজাদেহী লক্ষীর মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। জেগে ওঠে অপমানের বদলা নেবার। তাই গ্রামের সর্দার বাড়ি গিয়ে সে সব কথা খুলে বলে সর্নার রসবালা আর রাইগোযালকে হাতে নাতে ধরে। বিধান দেওয়া হয় ' টেন্ডারি ' করার। যখন 'টেন্ডারি' করে লক্ষীবালার বাড়িতে আনা হল যুগলকে এখন ঘরের দরজা বন্ধ করে ছেলেকে কোলে নিয়ে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে লক্ষীবালা। "সে রাতে হাতে নাতে ধরা পড়া রাইগোপাল ও রসবালাকে টেন্ডেরি দেওয়া হল। মাথা মুড়িয়ে জুতার মালা গলায় বুলিয়ে পিছনে পিছনে খ্যারা-কাসা-টিন বাজিয়ে গোটা জেলেপাড়া ঘুরানো হল দু'জনকে। পাড়া ঘুরিয়ে তাদের যখন রাইগোপালের উঠানে আনা হয় তখন দরজায় খিল লাগিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে অঝোর ধারায় কেনে যাচ্ছে লক্ষীবালা।" লক্ষ্মীবালার এই কান্নার তাৎপর্য অনেক স্বামীর কুকীর্তির অপমান, নিজেকে সকলের কাছে ছোট হয়ে যাবার অপমান, নারীত্বের প্রতি অসম্মানের অপমান এ সবই প্রকাশ পেয়েছে লক্ষীবালার চোখের জলে। এখানে লক্ষ্মীবালা একজন জেলেনি শুধু নয় সমগ্র জেলেনীদের প্রতিনিধি। যে প্রতিশোধ স্পৃহা তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল দীর্ঘ অবমানন ও অপমান থেকে তার জবাব সে দিতে পেরেছে 'বহঝার' গর্বী তার স্বানী রাইগোপালকে। গল্পটি ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। গল্পটির মধ্যে কৈবর্ত্য দাম্পত্য জীবনের একটি বাস্তবদিক উদ্ভাসিত হয়েছে ভাষা, সংলাপ, ঘটনা সবই বাস্তবসমৃদ্ধ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। 'টেন্ডেরি' প্রথা আজও চট্টগ্রামের কৈবর্ত। সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। অবৈধ প্রেমাসক্তিকে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে জুতোর মালা পরিয়ে গ্রাম পরিরুনা করাকেই গ্রামীণ একটি শব্দবন্ধে 'টেন্ডেরি' বলে এই গল্পে রাইগোপালের 'টেন্ডেরি' মাধ্যমে গল্পটি শেষ হয়েছে। অসহায় বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত লর্থীবালার চোখের জলেই গল্পটি পরিশুদ্ধ গল্পকার ভাষা প্রয়োগে একেবারেই Local Colour ব্যবহার করেছেন। কোথায় ভাষাকে কৃত্রিম করে তোলেননি। সহজ সরলভাবে এক অসাধারণ পরিপুষ্ট ছোটগল্প রচনা করেছেন হরিশংকর জলদাস। সেবাপরায়ণা পতিব্রতা, সংসারী, সব দিক থেকেই সক্ষীবালা অনন্য সাধারণ চরিত্র। তার প্রতিশোধস্পৃহা প্রতিবাদী রমণীর যথার্থতা প্রমান দেয়।

'একজন জলদাসীর গল্প' একটি সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পটির দুটি দিক পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, জগৎহরির মতো একজন হতদরিদ্র কৈবর্ত্য মানুষের অগাধ দেশপ্রেম ও অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রকাশ যেমন গল্পটির মূলসূত্র তেমনি দেশের কাজ করতে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া জগৎহরির

নিরাশ্রিতা অসহ্যর সন্তান সম্ভবা স্ত্রী ও তার জলদাসীর নির্মম জীবনাতিপাত এই গল্পের কাঠামো তৈরী করেছে। একদিন রাতের অন্ধকারে সন্তান সম্ভবা নিরাশ্রিতা স্ত্রীকে একপ্রকার মিথ্যা বলেই দেশের কাজে নৌকা নিয়ে বের হয়। তারপর ফিরে আসার পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে না। হারিয়ে যায় অজানালোকে। জলদাসী স্ত্রী তার আসার পথ চেয়ে বয়ঃবৃদ্ধা হয়ে যায়। একদিনের সুন্দরী মেয়েটি হয়ে ওঠে পাগলি তারপর কালের নিয়মে মারা যায় সে। গল্পকার তার স্বগতোক্তির মাধ্যমে গল্পটি বিবৃত করেছেন। গভটি একটি নিটোল ছোটগল্পের কাঠামো নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটনা অবলম্বনে গল্পটি রচিত। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মাঝে মধ্যেই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আশ্রয় নিত এবং গ্রামগুলির অধিবাসীদের অকথ্য অত্যাচার চলাত। বাংলাদেশি কমান্ডার ও সাধারণ মানুষ মিলিতভাবে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করত। পাকিস্তানের তৎকালীন সেনা প্রধান ইয়াইয়া খান এর সেনাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কমান্ডার সেলিম খোন্দকার জলদাস জগৎহরির বাড়িতে আসে। তার ডাক শুনে সে তার নৌকা নিয়ে তার সাথে রওনা দেয় কর্ণফুলি নদীর তীরে। যাবার আগে তার স্ত্রী সরলাবালাকে বলে যায় "বাধা না দিও। এই যায়ইম আর আইস্যাম।" কিন্তু জগৎহরি ভালোই জানে যাওয়াটা নিশ্চিত হলেও ফেরাটা নিশ্চিত নয়। খান সৈন্যদের হাঙ্গামা থেকে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। সরলাবালা কাতর মিনতি করলেও দেশপ্রেমে উজ্জ্বল চরিত্র জগৎহরির কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়। "আঁই জানি তুই কোনানে যাইতাছ। আঁই পোয়াতি। ঘরত কেউ নাই। তোঁয়ার কিছু হইলে আঁরে চাওইনা। কেউ নাই। পথের ভিখারি হওন পড়িবো। আর লাগে লগে তোঁয়ার সন্তানও যালালই অলিতে গলিতে দূরইবো।" স্ত্রীর এই সত্য এ আর্ত মিনতি সত্ত্বেও পাকিস্তানী 'খান সেনাদে'র বিরদ্ধে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। স্ত্রীকে সান্ত্বানা দিয়ে শুধু বলে যায়-"এইবারের মতো যাইতে দেও। সামনে আর কোনদিনও যাইতম নো। আঁই ত্বরাতরি ফিরি আইস্যাম কথা দিলাম।" এই প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রমাণ করে আর কোনদিনও ফিরে আসেনি সে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে সবাই ফিরে এলেও সে আর আসেনি। সরলাবালা তারা খাঁজে অক্রান্ত। দেখতে দেখতে চৌত্রিশ বছর কেটে গেলেও তার স্বামী আর আসেনি। অসহায় দারিদ্র, যন্ত্রণার মধ্যেই পুত্র পপৌত্রকে নিয়ে বেঁচে থেকেছে সে। স্বামীর ফিরে আসার আকুলতা নিয়ে অপেক্ষার মধ্যেই সরলাবালার মৃত্যু হয়। শ্মশানে শেষকৃত্য করে আসার সময় কথোপকথনের মাঝেই গল্পটি শেষ হয়। অভাগী জলদাসী সরলবালার চরিত্রটি এখানে পেয়েছে ভিন্নতর মর্যাদা। অন্য জলদাসীদের মতো স্বামীর হারিয়ে যাবার পর 'সাঙ্গা' করেনি। কেবল অকৃপণ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা নিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে। মৃত্যুতেও অপেক্ষার শেষ হয়নি। গল্পের শেষে তাই কথক কামনা করেছেন সরলাবালা ও তাঁর স্বামীর পুর্নমিলন। "আচ্ছা, যাই ভাই। বহুক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলাম। যদি পারেন এই দুখিনি জেলেনিটির কথা মাঝে মধ্যে স্মরণ করেন। আর যদি ভষ্টায় বিশ্বাস করেন তাকে আপনার প্রয়োজনের কথা বলে শেষ হলে, সরলাবালার কথা একটু বলবেন। কী বলবেন। বলবেন- অন্তত স্বর্গে হলেও সরলা যাতে জগৎহরির সাক্ষাৎ পায়।" বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ আত্মবলিদান যারা করেছিল তাদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের পরোক্ষ আত্মত্যাগ তথা আত্মবলিদানও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান প্রজন্ম তাদের সেই ত্যাগের ইতিহাস জানতে পারে না। এই গল্পে। জেলেনি। সরলাবালার আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল। গল্পটি করণ রসাত্মক ও হৃদয় বিদারক। প্রান্তবাসী। কৈবর্ত্য সমাজের নারীদের যন্ত্রণা এখানে পেয়েছে বহুমাত্রিক তাৎপর্য। সমুদ্রের জলে বিপর্যয়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া হোক কিংবা মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে না ফিরে আসাই হোক প্রতিটি ক্ষেত্রে কৈবর্ত্য জলদাসীদের জীবনে থাকে "শুধুই অপেক্ষা'। অন্যত্র গল্পকার এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন 'জলপুত্র' ও 'মোহনা' উপন্যাসে।

হরিশংকরের অন্যতম প্রধান গল্প 'চরণদাসী' একটি ভিন্নস্বাদের গল্প। এই গল্পে নাটকীয়তায় ভরপুর। স্বামী ভক্তি তথা কৃষ্ণভক্তির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা একটি কদর্য রূপকে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন চরণদাসীর

চরিত্রে। কৈশোরে সে প্রেম নিবেদন করেছিল গ্রামেরই জেলে হারাধন জলদাসকে এবং তার সঙ্গে শারীরিক মিলনেও প্রবৃত্ত হয়েছিল। তার পিতা মঙ্গলচরণ বহদ্দার যখন জানতে পারে তার কন্যা সন্তান সম্ভবুবা "গত দুই বাস ধরি চরণদাসীর মাসিক নাকি বন্ধ।" তখন পরিবারের সামনে এক বৃহৎ বিপর্যয় এসে উপস্থিত হয়। তার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচরণের কথাকে শেষ পর্যন্ত চৌরাশির বাবাকে নিয়ে পরামর্শ করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অবশেষে চরণদাসী বলে তার এ হেন ক্ষতি করেছে 'হারাধইন্যা'। শেষ পর্যন্ত গ্রাম ও পরিবারের প্রবল চাপের মধ্যে হারাধন ও চরণদাসীর বিবাহ হয়ে যায়। এভাবে কিছুদিন দাম্পত্যজীবন কাটার পর চরণদাসীর একটি সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মায়। তার বয়স এখন বারো। দীর্ঘদিন পর সন্তানলাভের ইচ্ছা জাগে হারাধন ও চরণদাসীর। চরণদাসীর পরামর্শে শহরের ডাক্তারের কাছে বীর্য পরীক্ষা করে জানা যায়। হারাধন জন্মণকে সন্তানের পিতা হতে অক্ষম। 'আপনার স্বামী হারাধনের সন্তান উৎপাদনের কোনও ক্ষমতা নাই। কোনওকালে ছিলও না।' এটাই পরীক্ষিত সত্য। তাহলে যে সন্তানকে হারাধনের বলে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করিয়েছে এব যে সন্তানকে হারাধন তার নিজের সন্তান বলে মনে করে সে প্রকৃতপক্ষে অন্য পুরুষের সন্তান। কিন্তু কার সন্তান? গল্পকার তার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছেন গল্পে। সুখনোহনের গায়ের রঙ সাহেবদের মতন, চরণদাসী সুখমোহনকে ডাকে গোরাচাঁদ বলে।" ধনী বহদ্দার সাধনের শালা আঁজলার সঙ্গেও চরণদাসীর কৈশোর প্রেম এসেছিল। তাকে দেখতে ছিল- "গোরা সাহেবের মতোন।" এখানে স্পষ্ট বলা যন্ত্রের সুখমোহন প্রকৃতপক্ষে চরণদাসী ও আঁজলার মিলনের সম্পদ। সে এটা জানত না এমন নয় কিন্তু হারার্কনের সাথে বিয়ে করতে চেয়েই এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। দীর্ঘ বার বছর স্বামীগত ও কৃষ্ণগত প্রাণ চরণদাসী সেই সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে। তাই হারাধনের সন্তান উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই এটা জানার পর সে অসহায়বোধ করেছে কেননা এই কঠিন সত্য জানার পর হারাধন কোন পথ অবলম্বন করবে সেই ভেবেই সে বিষন্নতা বোধ করেছে। এখানে স্ত্রীয়া চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন গল্পকার। গল্পটি একটি সার্থক ছোটগল্পের রূপ পরিগ্রহ করেছে ও সমাপ্তিতে 'শেষ হইয়া হইল না শেষ'-এর ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

'প্রতিশোধ' গল্পটি হরিশংকরের একটি সামাজিক গল্প হলেও এর ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক। এই গল্পের মধ্যেও বেশ কয়েকটি মাত্রা দেখা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবর রহমানকে হত্যা সহ তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার আবহে একটি সচ্ছল পরিবারের অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ার করুণ কাহিনীর পাশাপাশি স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের সমাজে নারীদের প্রতি শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কাহিনী এখানে একত্রিত হয়েছে। মাধুরীর মতো উচ্চশিক্ষিতা হবার স্বপ্নদেখা সুন্দরী মেয়েকে বাবা 'বিদেশি কোম্পানিতে কাজ' করা পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু মাধুরী সুখী হতে পারেনি। কেননা তার স্বামী ছিল মদ্যাসক্ত জুয়ারি ও অত্যাচারী। এরই পাশাপাশি শাশুড়ি ছিল 'দিজ্জাল'। শত অত্যাচারে অভুক্ত অর্ধভুক্ত অবস্থায় থাকলেও মাধুরী কোনদিনও তার বেদনার্ত জীবনের কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেয়নি। বাবার প্রতি এক তীব্র অভিমান থেকেই তার জীবনকে নিজে থেকে লুকিয়ে বাখতে চেয়েছে। স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে মাধুরী আজ এক বস্তা, তার চোখের কোণে কালি? 'লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত'। মারাও যায় জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে। তবু সে জোর করে পিতার বিবাহ দেবার বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে তার কোন আর্তি বাবার কান পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। গল্পের শেষে তার পিতা মাধুরীকে উদ্দেশ্য করে অনুশোচনা করে বলেছে- "আমায় ক্ষমা গরি দিও।" গল্পটির নামকরণটি অত্যন্ত সাংকেতিক ধর্মী। এখানে প্রতিশোধ নিয়েছে মাধুরী তার বাবার বিরুদ্ধে। তার পিতা তাকে জোর করে লেখাপড়া থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে বিবাহ দিয়েছিল, পাত্রের সম্পর্কে যথাযথ কোনও খোঁজখবর না নিয়েই। এই অভিমান মাধুরীকে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে তাই সে পিতার প্রতি প্রতিশোধ নেয় নিজেকে শেষ করে। এক নিদারুণ করুণ আবহ গল্পটিকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করেছে। মাধুরীর মৃত্যু, তার পিতার অনুশোচনা পঠকের কাছে আর্তি জাগায়। পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীর করাল গ্রাস থেকে যে মাধুরীকে

বাঁচানোর জন্য জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হত তাকেই না জেনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তার পিতা। তাই পিতার ও অনুশোচন। কম নয়। গল্পটি শেষ হয়েছে শোকে পাথর হয়ে যাওয়া পিতার আর্তি দিয়ে- "আমাকে মাফ করে দেরে মা, আমারে ক্ষমা করে দে।' বুকফাটা এই আর্তনাদের মধ্য দিয়েই গল্পটি যথার্থ ছোটগল্পের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

এই গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। হরিশংকর কৈবর্ত্য জীবন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন একদা। সেই গবেষণার বাস্তব ধর্মিতার সঙ্গে কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে এই গল্পটি রচনা করেছেন দেশপ্রেমিক ও স্বজাতিপ্রেমিক হরিশংকর জলদাস। 'চণ্ডক' জ্ঞানে বুদ্ধিতে বিচক্ষণতায় বাহুবলে একজন প্রকৃত রাজসেনানী। রাজা ভীম তাকে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য শ্রদ্ধা করতেন ও সর্বাগ্রে স্থান দিতেন। এ হেন চণ্ডক রাবাসনা গৃহে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এখানেই কিশোরী মোহনার সতীত্ব কিনে নেয় সে। প্রথমবার মিলিত হয়ে মোহনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এখানেই রামপালের দূত অনোমদর্শী এসে তাকে রামপালের সঙ্গে মিত্রতা করার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীকালে প্রধান সেনাপতির পুরস্কার পাবার আশায় 'বরেন্দ্রীসূর্য ভীমের সেবক' তার সঙ্গে প্রতারণা করে রামপালের সাথে যোগদান করে। ভীমের পরাজয় ঘটে এবং কৈবর্তা রাজার শাসন ভেঙে যায়। বিজয়ীর গর্বে উদ্ধত চণ্ডকের এই স্বজাতি দ্রোহিতা তথা দেশদ্রোহিতাকে মেনে নিতে পারেনি মোহনা। তাই সে তাঁর স্বামী বঁটির সাহায্যে চণ্ডকের মস্তক ছেদন করে তার প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছে। মোহনা জলদাসী জেলেনির মেয়ে। চণ্ডকও তাই অথব চণ্ডকের দেশদ্রোহিতা ও লালসা কৈবর্ত্য সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পেরেছিল। তাই চণ্ডকের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করে মোহনা তৃপ্ত হয়েছে। গল্পটির মধ্যে বেশ্যাপল্লির সংস্কার ও লৌকিক আচার আচরণের সুন্দর ও বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। সুন্দরী কিশোরী মোহনার সঙ্গে লোহার বঁটির বিবাহ হয়েছিল বারাঙ্গনাদের সামাজিক নিয়ম মেনেই। "এই বৃত্তিতে ব্রতী হবার প্রথম দিনের কথা। সদ্য রজঃজলা হয়েছে সে। বামুন ঠাকুর এসে গোধূলি লগ্নে একটি বঁটির সঙ্গে বিয়ে দিল তার। সিঁথিতে চিক করে সিঁদুর দিল। গলায় উঠলো গাঁদা ফুলের মালা।" অক্ষতযোনি বারাঙ্গনাদের কুমারিত্ব বিক্রি হত। চণ্ডক 'আধাপন কড়ি' দিয়ে মোহনার সতীত্ব ক্রয় করেছিল। গল্পকার এই গল্পে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সুন্দর ও যথাসম্ভব বাস্তব করে উপস্থাপন করেছেন। গল্পটি ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। মোহনার চরিত্রের বিবর্তনটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। তার প্রতি চণ্ডকের শারীরিক অত্যাচার সে সহ্য করতে পারে কিন্তু দেশদ্রোহিতা, বেইমানী সে সহ্য করতে পারে না- মোহনার চরিত্রে এই মহান দিকটি দারুণ ইঙ্গিতময়তায় পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। যাকে সে প্রেম নিবেদন করেছে এবং ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে তাকেই নিজ হাতে খুন করে দেশপ্রেমের বিজয়বাণী ঘোষণা করেছে সে। মোহনা চরিত্রটি একটি গতিশীল চরিত্র। গল্পটি হরিশংকর জলদাসের পরিণত মানসিকতার অপূর্ব নিদর্শন ও বাংলা ছোটগল্পের অভয় সম্পদ। 'দুলারি' এবং কয়েকজন গল্পটি দুলারি নাম একটি বিবাহে প্রতারিত মহিলার অসহায় রূপের আড়ালে যৌনবৃত্তি করা এবং তার সঙ্গে কয়েক টানাপোড়েন গল্পের বিষয়বস্তু। দুলারি প্রকৃতপক্ষে কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের মেয়ে, কাজ করত চট্টগ্রামের একটি গারমেন্টস কোম্পানিতে। সেখানেই দুই সন্তানের পিতা বিবাহিত কায়স্থ শাম দত্তের সঙ্গে প্রেমে পড়ে এবং পরিণামে বিবাহ ও সন্তান হয়। যখন দুলারি জানতে পারে সে প্রতারিত হয়েছে সে বিকৃত মস্তিষ্ক হয় পড়ে। অধ্যাপকদের ফ্ল্যাটের নীচে সে আশ্রয় নেয়। নানা লোক এসে তাকে ধর্ষণ করে। অধ্যাপক নিজের চোখে সেটা দেখে। শহরের মন্তানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জবীন সংশয় হতে পারে জেনে সে একটু প্রতিবাদ করেও পিছিয়ে আসে। যাদের একদিন দুলারির ধর্ষক বলে মনে করেছিলেন তারাই দুলারির আশ্রয়দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এসব দেখে অধ্যাপক বাড়ি বদলানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং বাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। যাবার সময় আপাত বিকৃত মস্তিষ্ক দুলারি তার ক্ষমতার বড়াই করে বলে- 'অধ্যাপক গাড়িতে ওঠার সময় শুনলেন, দুলারি চিৎকার করে বলছে 'কার লগে লাগতে আইছিলি হারামির পোলা? লাগতে আসার আগে

চিন্তা করস নাই- মাগির পাওয়ার অনেক?" যাকে এতদিন আশ্রয়হীন মনে করে আশ্রয় দেবার দুর্মর যন্ত্রণায় অধ্যাপক চিন্তিত হয়েছে সেই দুলারি নিজেকে ক্ষমতাশালী ভাবে। যাকে ধর্ষণ করছে ভেবে অধ্যাপক ঘৃণায় লজ্জায় অনুশোচনা করতে মনে মনে সে খরিদ্দার এর থেকে টাকা নিয়েই যৌনবৃত্তি করছে। তাহলে আসল অসহায় কে? অধ্যাপক না। দুলারি। এই প্রশ্নই জাগে গল্পটি পাঠ করলে। দুলারি নয় অধ্যাপকই অসহায় অবস্থায় গৃহত্যাগ করে। গল্পটির মধ্যে দুলারি চরিত্রটি করুণা ও মমতার মধ্যেও হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

হরিশংকর জলদাসের 'মোহনা' গল্পটি এমন একটি গল্প যেখানে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমস্ত দিক দিয়েই একটি সার্থক ছোটগল্প। মোহনার বেশ্যা হয়ে যাওয়া এবং কৈবর্তা রাজল ভীমের সেনা চণ্ডকের প্রথম মিলন ও পরবর্তীতে তাদের গভীর প্রেম এবং পালরাজার কাছে দেশকে পরাধীন করে দেবার প্রবান 'বেইমান' চণ্ডকের মস্তক ছেদন করে মোহনা, এবং দেশদ্রোহীর প্রতি প্রতিশোধ নেয় মোহনা। গল্পটির বিষয়বস্তু এটাই। ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে লেখা হয়েছে এই গল্পটি। কৈবর্ত্য সমাজের অতীত কেবল জলদাসীর গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি নয় তার অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলির গল্পগুলিও মূলত কৈবর্তী সমাজের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তাঁর পূর্বচা' ইরকিশোরবাবু, 'মাকাললতা প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্পই তার মূল ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অবহেলিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণীর অবহেলা। ঘৃণার বিন্দু বিন্দু অশ্রু গল্পের মধ্যে বিকশিত হয়েছে যেন। গল্পের নামকরণ গুলোকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়। 'হকিশোরবাবু' দেহ রতন, থুতু, হৃদয়কথা, সুবল, জ্যেঠা, ম্যাডাম, অধরা, সোনালী আঁধার আহার ইদানীং প্রভৃতি গল্পের মধ্যে নিম্নবর্গীয় মানুষও তার জীবনের কথা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের কথাও কয়েকটি। গল্পে এসেছে। 'হরকিশোরবাবু' গল্পে লেখক হরিশংকরের জীবনের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস লিখতে লিখতে আর বই ক্রয় করতে করতে একটি পুরোনো সেক্ষে রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। বইয়ের চাপে একদিন লেখক হরকিশোরবাবুর মাথায় ভেঙে পড়ে সেল্ফ, তিনি মারা যান। তারপর তার স্ত্রী বইগুলোকে কেজি দরে কাগজ বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেন। হরিশংকর নিজেই দুঃখ করে লিখেছিলেন যাদের কথা তিনি লেখেন তারাই তার সাহিত্য পাঠ করে না। জানেও না তাঁকে। গল্পটি এমনই এক খেদের প্রকাশ। হরকিশোর বাবুর জমানো কিংবা লেখা বইগুলোর মাহাত্মা বোঝার ক্ষমতা অথবা ইচ্ছা কোনটাই তার স্ত্রীর ছিল না তাই ঘরের অতিরিক্ত হিসাবে কেজি দরে সাহিত্যিক বিক্রি করতে চেয়েছে। 'থুতু' গল্পটি নিম্নশ্রেণীর অসহায় দরিদ্র মুসলমান কন্যা ফারহানার প্রতি মুক্তিযুদ্ধের শান্তিকমিটির বেয়ারম্যান বশির উদ্দির কুকর্ম এবং শান্তি কমিটির নামের আড়ালে তাদের কদর্য রূপটি এই গল্পে স্থান পেয়েছে। কতকগুলি অনুগল্প লিখেছেন হরিশংকর জলদাস। 'মেথর', খুবসুরত, 'কোমা কোনো রাইতে' ইত্যাদি অনুগল্পগুলিও মূলত কৈবর্ত্য সমাজের চাওয়া পাওয়া, প্রেম, অসহায়তা, ঘৃণা ইত্যাদি অ অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

হরিশংকর জলদাসের সাহিত্য রচনার মূল কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে 'হরিশংকর নিজে প্রান্তিক সমাজের মানুষ। তাই তার লেখায় ডোম, মুচিজ, মেথর জেলে ইত্যাদির কথাই বারবার ফিরে আসে। তিনি বলেন, জেলে সমাজে জন্মেছি বলে এ সমাজ আমার ভালোভাবে জানা। তাই জেলে সমাজকে জানতে হলে অবশ্যই হরিশংকরকে পাঠ করতে হবে। নদী-সমুদ্রের মানুষজন হরিশংকর জলদাসের পরম আগ্রহের বিষয়। তার 'জলদাসীর গল্প' গ্রন্থের গল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী পতেঙ্গার জলদাসীদের বাস্তবমুখ্য আলেখ্য তাঁর ছোটগল্পগুলি। আঞ্চলিকতার বর্ণে রাঙানো এই গ্রন্থের দশটি গল্পই প্রতিনিধি স্থানীয় যে কোন গল্পের সাথে তুলনা করা যেতেই পারে হরিশংকর একজন কৃতবিদ্য সাহিত্যিক। তাই তাঁর সাহিত্য সর্বদাই লক্ষ্য সচেতন ও গন্তব্যমুখী-জলদাসীর গল্প তার ব্যতিক্রম নয়। প্রান্তবাসী ব্রাত্যজনের অবিংসবাদী দলিল এই গল্পগুলি। কৈবর্ত্য জনজাতির চলমান ইতিহাস বিবেকবান দ্রষ্টার কলমে

পেয়েছে সত্যের সৃষ্টিরূপ। সেই কারণেই সমালোচক ঠিকই বলেছেন- "Horishankar Kind less the optimism that shines in his protagonists and that has his readers shine as well.."৩

কথাসাহিত্যের পাশাপাশি প্রবন্ধ রচনাতেও সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন হরিশংকর জলদাস। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটেছিল প্রাবন্ধিক হিসাবেই। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেখা শুরু করেন এবং ২০১০ পর্যন্ত তিনি সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক প্রণক্ষ রচনাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে তার ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রথম আবির্ভাব ঘটে। সেদিক থেকে দীর্ঘ দশবছর তিনি প্রবন্ধ রচনাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তার সারস্বত প্রতিভাকে। বলা ভালো তার। কথাসাহিত্যের প্রধান ও একমাত্র বিষয় মুখ্যত দলিত ব্রাত্য কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা তা পরিণত হাতে রচনা করার জন্য প্রাথমিক ও যথার্থ প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধই বজ্রগত প্রবন্ধ। যে কারণে প্রবন্ধের মধ্যে যে চরম বাস্তবতা থাকা দরকার তা প্রতিফলিত করার জন্যই তিনি কৈবার্তা জীবন নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনো ও ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলেন। সেই অর্জিত জ্ঞানই দীপশিখা হয়ে উপন্যাসগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। সেই কারণে কৈবর্ত্য জীবনকেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলি উপন্যাস রচনার পূর্ববাজ বলে মনে হয়। তার প্রবন্ধগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কৈবর্ত্য জীবন ও সমাজের প্রবন্ধ, দ্বিতীয়ত, বিশুদ্ধ সাহিত্য ও সমকালীন সমাজ ও সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধ। কৈবর্ত্য সমাজের কথা বলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। কেননা তিনি নিজে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হবার কারণে ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন সর্বত্রই অপমানিত ও অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাদের তিনি উপযুক্ত জবাব দেবার কারণে ডক্টরেট গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন কৈবর্ত্য সমাজকেই। তাঁর গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল "নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত্য জীবন কথা।" এখান থেকেই তিনি তার ভবিষ্যত পথরেখা ও গন্তব্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। কৈবর্ত্য জীবনের কথাই তার গবেষণার মতো তার উপন্যাস ছোটগল্পের তথা প্রবন্ধেরও বিষয়বস্তু হয়েছে। হবিশংকর নিজেও তাঁকে কৈবর্ত্য কথাসাহিত্যিক হিসাবে মনে করে থাকেন।

তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হল-'লোকবাদক বিনয়বাঁশি (২০০৪), কবিতা ও ধীবর জীবন কথা (২০০১) ,কবি অদ্বৈতমল্লবর্ম এবং (২০০২), ছোটগল্পে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (২০০২), জীবনানন্দ ও তার কালী বাংলা সাহিত্যের অনুষঙ্গ (২০১২)।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট লোকশিল্পী ঢোলবাদক বিনয় বাঁশি জলদাসের জীবন অবলম্বনে রচিত। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি জগতে তিনিই ছিলেন নিম্নবর্গের জলদাস সম্প্রদায়ের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি একুশে পদক লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বোয়ালখালি উপজেলায় জন্ম হযেছিল বিজয়বাঁশির। বিজয়বাঁশির সঙ্গে হরিশংকরের জাতিগত ও বর্ণগত সম্বন্ধ ছিল। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হওয়া বিনয়বাশিকে অবলম্বন করেই প্রবন্ধটি রচিত।

‘কবিতা ও ধীবর জীবনকথা' প্রবন্ধটিতে ধীবর জলদাস জীবনের গবেষণামূলক ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। এখানে কৈবর্তা সমাজের ঐতিহাসিক পরিচয় ও তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতির কথা গবেষকের কলামে লিখিত হয়েছে। প্রবন্ধের নিরপেক্ষতা ও মননের দৃঢ়তা লক্ষাগোচর হয়েছে। 'কবি অদ্বৈত মল্লবর্মন এবং' প্রবন্ধটিতে দেখা সমাজের প্রসিদ্ধ 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর লেখকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । প্রান্তজীবি ও মৎস্য শিকারী কৈবর্ত্যদের জীবনের অনালোকিত দিকগুলি অদ্বৈত তার সাহিত্যে যেভাবে তুলে ধরে কৈবর্ত্য সমাজকে আলোকিত করেছেন এখানে সেই বিষয়গুলিই প্রাবন্ধিক লিপিবদ্ধ করেছেন। 'জীবনানন্দ ও তার কাল' প্রবন্ধে তিনি 'বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত পথিক' জীবনানন্দ ও তার সময়ের 'কালবেলা'কে প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। যুগের ভয়াবহতা ও জীবনানন্দের কাব্যদর্শনই এই প্রবন্ধের মূল কথা। 'বাংলা

সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ' প্রবন্ধটিতে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক নানা বিষয় প্রবন্ধের আকারে তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিকের যেসব গুণাবলী থাকা দরকার তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি একজন সমাজজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত গবেষক হবার কারণে তার প্রবন্ধগুলি সবদিক থেকেই বাস্তবতার সীমালগ্ন, বস্তুগত প্রবন্ধই তিনি রচনা করেছেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তিনি লেখেননি। গবেষকের কলমে যখন একটি বস্তুগত প্রবন্ধ লেখা হয় তখন তার মধ্যে গভীরতম সত্যের প্রকাশ থাকে। হরিশংকর জলদাসের রচিত প্রবন্ধে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

হরিশংকর জলদাস নিজে কৈবর্ত্য সমাজের মানুষ। সেই কারণে তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখায় কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের অনুষঙ্গ কিংবা উপস্থিতি সক্রিয়ভাবেই এসেছে। কোথাও সরাসরি তিনি কৈবর্তদের ইতিহাস অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন কোথাও বা সাহিত্যের মোড়কে কৈবর্ত্য সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা তুলে ধরে গর্ববোধ করেছেন। মোট কথা অন্ত্যজ কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের প্রকৃত ইতিহাসকার তিনি একথা বললে ভুল হবে না। সেই কারণেই বোধহয় কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের কথাকার হয়েও কৈবর্ত্য সমাজে তার বড় হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং অপমানের প্রতিশোধ নিতে কলম তুলে নেবার কথা আলাদা করে বলতে হয়েছে। কেননা অদ্বৈত মল্লবর্মন কিংবা অন্যান্য কৈবর্ত্য সাহিত্যিকরা কেবল সাহিত্যের অনুষঙ্গে কৈবর্ত্য সমাজ ও জীবনজীবিকাকে তাদের সাহিত্যে এনেছেন কিন্তু হরিশংকর জলদাস কেবল সাহিত্যের পাতায় তাদের আনেননি বরং তাদের সামগ্রিক চালচিত্র ও ইতিহাস রচনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর 'কৈবর্ত্যকথা' (২০১১) ও 'নিজের সঙ্গে দেখা' গ্রন্থদুটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। কোথাও নিজের বাল্য ও কৈশোরের কথা। কোথাও বা সাক্ষাৎকার নিয়ে বইদুটি রচিত এই দুটি গ্রন্থে হরিশংকর জলদাসের আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমরা তাঁর এই গ্রন্থ দুটি আলোচনা করে হরিশংকর জলদাসের অচেনা জীবনের কাহিনী জানতে পারব। 'নিজের সঙ্গে দেখা' গ্রন্থটির দুটি ভাগ আছে এবং দ্বিতীয় অংশে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও সাহিত্যবোধ তুলে ধরেছেন। প্রথম অংশে সাতটি প্রবন্ধ আছে- (১) আমার কর্ণফুলি (২) সমুদ্র এখনো আমায় কাছে টানে (৩) সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে (৪) উজ্জ্বল আমার দিকে (৫) বাল্য শিক্ষা - আমার প্রিয় বই (৬) আমার একদিনের বাংলা একাডেমি (৭) মর্মতলে বৃষ্টি পতন। প্রতিটি অংশই নিজের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা। ভাষা শৈলী উপস্থাপনায় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ দুটি বেশ উপভোগ্য ও হরিশংকর জলদাস ও তার কৈবর্ত্য সমাজকে গভীরভাবে জানার জন্য বিকল্পহীন।

হরিশংকর জলদাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভা। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসকে তিনি সমুদ্রের জল পর্যন্ত নিয়ে গেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রকেন্দ্রিক উপন্যাসের জন্মদান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এ এক অভাবনীয় নতুনত্বের সংযোজন। নিম্নবর্গের কথা বাংলা সাহিত্যে প্রতুল হলেও কোনও একটি নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার তাগিদ অনুভব করেননি কেউই। হরিশংকর জলদাস সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী স্রষ্টা। তিনি নিজে ব্রাত্য সমাজের অবহেলিত মানুষ। তাঁর অনুভূতির মধ্যে ছিল তীব্র যন্ত্রণা ও অবহেলার চাপা আর্তনাদ। তিনি কলম তুলে নিয়েছিলেন মধ্যবয়সে পৌঁছে, আশৈশব অপমানের জবাব দিতে। তাই তার নিজ কৈবর্ত্য সমাজের ইতিহাস থেকে ভূগোল, ঐতিহ্য সংস্কৃতি থেকে অর্জন সবই গবেষণার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক লেখনীতে প্রকাশ করেছেন। তার ধ্যানজ্ঞান ছিল কেবর্ত্য সমাজের প্রকৃত সত্যরূপগুলি উদ্‌ঘাটন করে দেখানো। তার হাতেই কৈবর্ত্য সমাজ জীবন্ত হয়েছে। কৈবর্ত্য সমাজের ইতিহাসকার তিনি। যা বাংলা সাহিতো ইতোপূর্বে ছিল না। একজন স্বজাতির হাতে যখন নিজ সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিখিত হয় তখন তার বাস্তবতা থাকে অনেক বেশি। হরিশংকর জলদাসের প্রতিটি রচনাই বাস্তবের সীমালগ্ন। তাঁর চরিত্ররা প্রাত্যহিক জীবনে দেখা সাধারণ দলিত চরিত্র তার স্ব সম্প্রদায় ও সমাজের মানুষ। সাহিত্যে ভাষাপ্রয়োগে তিনি প্রায় কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। গালি ও অশ্লীল বাক্যকে তিনি

অনায়াসেই তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন অতি স্বাভাবিক ও অসাধারণ ভঙ্গিমায়। শৈলী নির্মাণেও তিনি অগ্রজ কাউকেই অনুসরণ করেননি। নিজস্বতা ও নতুনত্বের অপূর্ব রসায়ন ঘটেছে তাঁর লেখায়। বাংলাদেশের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিপথ বিচিত্রগামী। বেশিরভাগ ঔপন্যাসিক যেখানে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সংসারের পাকেচক্রে সাহিত্যকে টেনে নিয়েছেন, হরিশংকর সেখানে ব্যতিক্রম তিনি মধ্যবিত্তের কাহিনী কয়েকটি উপন্যাসে লিখলেও, ব্রাত্য জলদাস জলদাসীরাই তার সাহিত্যের কুশিলব। তাঁর মতো কৈবর্ত্য সমাজের কথা ইতোপূর্বে কোনও ঔপন্যাসিক বলতেও পারেননি আর ভবিষ্যতেও বলা অসম্ভব। হরিশংকর জলদাস এখানে অপরাজেয় ।

****

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(ক) আকর গ্রন্থ

১। জলদাস হরিশংকর, মহীগর, ২০১১, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

২। জলদাস হরিশংকর, 'হাদয়নদী', অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৩, ঢাকা।

৩।জলদাস হরিশংকর 'দহনকাল' মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০, ঢাকা।

৪।। জলদাস হরিশংকর, 'জলপুত্র', মাওলা ব্রাদার্স, ২০১:২, ঢাকা।

৫। কসবি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১১, ঢাকা।

৬। জলদাস হরিশংকর, 'প্রতিদ্বন্দ্বী', মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪, ঢাকা।

৭। জলদাস হরিশংকর, 'আমি মৃণালিনী নই', প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, ঢাকা।

৮। জলদাস হরিশংকর, 'মোহনা' প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, ঢাকা।

৯। জলদাস হরিশংকর, 'রামগো লাম' প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, ঢাকা।

১০। জলদাস হরিশংকর কোন এক চন্দ্রাবতী', চন্দ্রদীপ প্রকাশন, ২০১৫, ঢাকা।

১১ জলদাস হরিশংকর 'এখন তুমি কেমন আছ', প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫, ঢাকা।

১২। জলদাস হরিশংকর 'লোকবাদক বিনয়বাঁশি', গতিধারা প্রকাশন, ২০০৪, ঢাকা।

১৩। বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ' রোদেলা প্রকাশনী, ২০১২, ঢাকা।

১৪। জলদাস হরিশংকর 'হরকিশোরবাবু' অন্যপ্রকাশ, ২০১৪, ঢাকা।

১৫। জলদাস হরিশংকর 'নিজের সঙ্গে দেখা' মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫, ঢাকা।

১৬। জলদাস হরিশংকর 'লুচা অবসর প্রকাশন, ২০১২, ঢাকা।

১৭। জলদাস হরিশংকর 'আমার কর্ণফুলি' বাতিঘর প্রকাশন, ২০১৬, ঢাকা।

১৮। জলদাস হরিশংকর 'বাছাই বারো' চন্দ্রদীপ, ২০১২, ঢাকা।

১৯। জলদাস হরিশংকর 'মাকাললতা' মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫, ঢাকা।

২০। জলদাস হরিশংকর 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত', অবসর।

২১। জলদাস হরিশংকর 'গল্পসমগ্র' ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬ ঢাকা।

২২। জলদাস হরিশংকর 'একলব্য', অন্যপ্রকাশ, ২০১৫

২৩. জলদাস হরিশংকর 'কাঙাল' গদ্যপদ্য, ২০১৪

২৪। জলদাস হরিশংকর, কৈবর্ত্য কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০

২৫। জলদাস জীবনানন্দ ও তার কাল, শুদ্ধস্বর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১০, ঢাকা।

(খ) সহায়ক গ্রন্থ

১ যেন সত্যেন, 'বিদ্রোহী কৈবর্ত্য', 'খান ব্রাদার্স' ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

২। ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, কলকাতা।

৩। চৌধুরী শামগুল হুদা, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, জুন, ১৯৮২, ঢাকা।

৪। রহমান মাহফুজুর, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণাকেন্দ্রে চট্টগ্রাম, মার্চ ১৯৯৩

৫। চৌধুরী আহমেদ আজিন, চট্টগ্রামী ভাষার অভিধান ও লোকাচার, গতিধারা প্রকাশন, ২০১২।

৬। রসিদ আল মামুন, বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গ, শুদ্ধস্বর প্রকাশন, ২০১০।

৭। সামন্ত প্রভাসচন্দ্র 'নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস', প্রভা প্রকাশনী, ২০০৪।

৮। গুপ্ত ক্ষেত্র 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস'।

৯। বন্দ্যোপাজায় শ্রীকুমার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০।

১০। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা' বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, দে'জ পাবলিশিং,

(গ) সহায়ক পত্রপত্রিকা ও জলধান উৎস

১। কালিকলম, সম্পাদক মোহিতকামাল।

২। সমকাল, ১০ই জুন, ২০১৫

৩। ভোরের কাগজ, ৩রা জুন, ২০১৭, শনিবার, নাট্যালোচনা, সমুদ্রপারের জেলেদের লড়াইয়ে গল্প।

৪।বাংলাদেশ প্রতিদিন 'সাহিত্যের প্রকরণ ও বিষয়', ১৩ মার্চ, ২০১৫।

৫।ভোরের কাগজ, অদ্বৈত মল্লবর্মন: ব্রাতা মানুষ ব্রাত্য কথাকার, সৌম্য ৩রা জুন, ২০১৬

৬।ভোরের আলো, 'আলোকিত জীবন জলপুত্রের জীবন বায়', ১৭ই নভেম্বর, ২০১১

৭।দৈনিক আজাদী, মোরশেদ তালুকদার, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১১

৮। ঈশানের পুঞ্জমেঘ, ড. হরিশংকর জলদাসের সাথে ধরাকের জলপুত্র, মতবিনিময়, শৈলেন দাস, ৩১ মার্চ, ২০১৬, বৃহস্পতিবার।

৯। গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন, সাক্ষাৎকারে হরিশংকর জলদাস, জানুয়ারী ১৪, ২০১৬

****

ORCID NO-0009-0000-3743-9282